Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 153 – 159
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্প : মানুষের অন্তর্লীন সংঘাত ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পরিসংখ্যান

রুমা চক্রবর্তী
বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : rumaachakrabarty@gmail.com

Keyword

Abstract

Discussion

বাংলাদেশের বিংশ শতাব্দীর লেখক হুমায়ুন আহমেদ (১৯৪৮খ্রি. - ২০১২খ্রি.) নিজেই শুধু সৃষ্টিশীল লেখক নন, তাঁর সৃষ্টি পাঠকসমাজকেও সৃষ্টিশীল করে তোলে পরোক্ষভাবে। তাঁর ছোটগল্পগুলি সমাজের নানা স্তরের, নানা মতাদর্শের মানুষের মনের আনাচে-কানাচে আলো ফেলে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছে। সমাজের প্রতিটি শ্রেণির মানুষের মনন-চিন্তনকে কাটাছেঁড়া করে যে সারবস্তু লেখক আহরণ করেছেন, তারই এক-একটি গবেষণালব্ধ ফসল আহমেদের গল্পগুলি। তবে, গবেষণার শেষে যেমন গভীর পর্যবেক্ষণজাত উপলব্ধি বা স্থির সিদ্ধান্ত থাকে, তা অনুপস্থিত। সিদ্ধান্ত নেবার ভার তিনি সম্পূর্ণ পাঠকের উপর ছেড়ে দেন। যেন গল্পের খিদে ধরিয়ে দিয়ে হঠাৎই উধাও হয়ে যান। আর পাঠককূল সেই খিদের জ্বালায় ছটফট করতে করতে নিজেরাই স্বপ্ন ও কল্পনার জাল বুনতে থাকে। হয়ে ওঠে নিজেরাই গল্প-রাঁধুনি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের ধরনই এমন। মৃত্যুর আগে একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর মাত্র তেষট্টি বছরের জীবনের লেখালেখি সম্পর্কে বলেন,

> "এটা আমার কাছে আনন্দের কাজ বলেই ৪১ বছর ধরে লেখালেখি করে যেতে পারছি।"[১]

বিভিন্ন বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের স্রোতে আলো ফেলেছেন লেখক। তার কিছু কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস রয়েছে। যেমন,

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে : মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত 'উনিশশো একাত্তর' গল্পে স্বল্প পরিসরে একটি খণ্ডচিত্রের মাধ্যমে পাকিস্তানিদের অকথ্য অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন হুমায়ূন আহমেদ। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের সময় যে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল, তার মূল্য পূর্ববঙ্গের মানুষ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সমকালে রক্তের বিনিময়ে দেন। পশ্চিম পাকিস্তান চিরকালই নিজেদের আধিপত্য কায়েম রাখতে চেয়েছিল পূর্ববঙ্গের উপর। কিন্তু এত দূর থেকে প্রশাসনিক পূর্ববঙ্গকে

স্বতন্ত্র রাষ্ট্র করতে চেয়ে বহু নিরীহ মানুষ প্রাণ দিয়েছেন, সম্মান খুইয়েছেন, শহীদ হয়েছেন। আলোচ্য গল্পে কোনও রক্তপাতের ঘটনা নেই, আছে অসম্মানের কাহিনি। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল। পাকিস্তানি প্রশাসকদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য গ্রাম ত্যাগ করে গ্রামবাসী। শুধু থেকে যান স্কুল-শিক্ষক আজিজ, অনেকটা বাধ্য হন। সোনাপোতা থেকে আগত তার ছোট বোনের প্রসব-বেদনা শুরু হয়েছে। সেও যাতে সুরক্ষিত থাকে এবং অন্যদের মতো পালিয়ে যেতে পারে, তার জন্য আজিজ বলেছিলেন, "ধরাধরি কইরা নাওডাত নিয়া তুললে শ্যামগঞ্জ লইয়া যাওন যায়!"[২] কিন্তু তার কাপুরুষতার ত্রুটি ধরে তার নিজেরই মা কুৎসিত গালাগালি দিয়ে পা-ভাঙা বিড়ালের সঙ্গে তুলনা করেন। সেই স্কুল-শিক্ষকই যখন অত্যাচারী পাকিস্তানি উর্দিধারীদের সামনে যান, তখন ছাই-চাপা আগুনের মতো তাঁর ব্যক্তিত্বের উত্তাপ পাঠকদের অভিভূত করে। যুদ্ধক্ষেত্রে দু'রকম পরাজিত যোদ্ধা থাকেন। প্রথমত, যারা প্রাণ-ভয়ে পালিয়ে যায়; দ্বিতীয়ত যারা বীরের মতো যুদ্ধ করে এবং প্রাণ দেয়। আজিজ হলেন দ্বিতীয় শ্রেণির যোদ্ধা। অনেকটা "করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পঞ্জা।"[৩] সম্মুখ সমরে শত্রুর চোখে চোখ রেখে তিনি বলতে পারেন যে, তাকে পছন্দ করেন না। শিক্ষকরা মানুষ গড়বার কারিগর, সমাজের বুদ্ধিজীবী। লেখক এই চরিত্রের বিপরীতে একটি পাগল চরিত্রকেও রেখেছেন যে অশিক্ষিত, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। কোনও অপমানবোধও নেই তার। পাগলাটে ধরনের মানুষটি পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি হয়েও তাই হাসিতে ফেটে পড়ে। হত্যা বেশি অপমানের, যখন তা প্রাণের নয় মানের ও সম্মানের হয়। মেজর সাহেব বুঝেছিলেন, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে অপমান করা সম্ভব নয়, আবার প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষকে প্রাণে মেরে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধও করতে চান না। তাই চল্লিশ বছর বয়সী অকৃতদার যুবক শিক্ষককে সর্বসমক্ষে উলঙ্গ করে সম্মানকে হত্যা করার প্রয়াস করেছেন। কিন্তু সফল হননি। যেমন করে সফল হয়নি মহাভারতের পাশাখেলার ভরা-সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণকারী দুঃশাসন। তাই বস্ত্র যারা কেড়ে নিয়েছে, তাদের বস্ত্র পরে নেওয়ার আদেশ দেবারও অধিকার নেই। মেজর সাহেবের বস্ত্রে তীব্র ঘৃণার থুতু ছিটিয়ে উন্নত মস্তিষ্কে শিক্ষক দাঁড়িয়ে থাকেন বিজয়ীর মতো, নতুন বাংলাদেশ গড়বার স্বপ্ন চোখে নিয়ে। মনে পড়ে যায়, মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' গল্পটির সেই দোপ্‌দি মেঝেন নামের আদিবাসী নারীটিকে, যার আত্মশক্তির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এই আত্মশক্তিই আজিজের মধ্যেও দেখা যায়। তার বহিরঙ্গের যে উলঙ্গ প্রকাশ দেখে পাগল লোকটা তাকে বার বার বস্ত্র না থাকা সম্পর্কে সচেতন করাতে চায়, সেই অবস্থাই মেজর সাহেবের মনে ভয়ের সঞ্চার করে। কেননা এই উলঙ্গ প্রকাশেই ঈশ্বরের দিব্য বস্ত্রের সম্মানের আবরণ, যাকে আর নিরাবরণ করা অসম্ভব।

'শীত' গল্পে বিধবা ফুলজানকে ঘিরে রয়েছে কেমন যেন এক রহস্য। বিশেষ করে প্রত্যেক রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে চাপা কান্না কি শুধুই মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হওয়া স্বামীকে উৎসর্গ করে? না কি অন্য কোনও দ্বিধা? গল্প শুরু হচ্ছে তার বিপত্নীক শ্বশুর মতি মিয়ার নিঃসঙ্গ বার্ধক্যের হাহুতাশ দিয়ে। মৃত নবযুবক পুত্র মেছের আলির অভাব অনুভব করে। নাতি ফরিদকে পাশে পেতে চায় 'ওম' হবার জন্য। এমনকী প্রবল দারিদ্র্য সত্ত্বেও শীত সহ্য করতে না পেরে ভাবে, ফুলজানের আরও বাচ্চা থাকলে ভালো হত। মতি মিয়া বারংবার ফুলজানকে অনুরোধ করে রিলিফের কম্বল নিয়ে আসতে। কিন্তু রশিদ সাহেবের কাছে তার যেতে ইচ্ছে করে না। এই অনিচ্ছাটা এতটাই ঘৃণামিশ্রিত যে আগের বার রিলিফের গমও নিতে যায়নি। বহু কষ্টে পা টেনে টেনে মতি মিয়া তা নিয়ে আসে। শ্বশুরকে দৃপ্ত কণ্ঠে জানিয়ে দেয়, "কম্বলের আমার দরকার নাই। শীত লাগে না আমার।"[৪] সকালে বেরিয়ে যায় দারোগা বাড়ি, একজনের ভাত এনে আড়াই জন মিলে খাবে বলে। যেন অনেকটা সি. ও. রেভিন্যু রশিদ সাহেবের হাত থেকে বাঁচার জন্য। অন্যদিকে, মেছের আলির ছেলে ফরিদের পরিচয় পেয়ে রশিদের বিরক্তি চোখে পড়ার মতো। লেখকের দেওয়া চাপা ইঙ্গিত আর প্রচ্ছন্ন থাকে না। কম্বলের সঙ্গে প্রাপ্তি পঞ্চাশ টাকা। সেটা কি মেছের আলির বীরত্বের কথা শুনে? না কি মেছের আলির নামে 'শহীদ মেছের আলি সড়ক' হয়েছে বলে? এত দয়ালু স্বভাবের মানুষকে এড়িয়ে থাকে কোন দ্বিধায়? রাতের অন্ধকারে ফুলজানের নিঃসঙ্গ চাপা কান্না কি তার পাণিগ্রাহী রশিদ সাহেবের কাছে যেতে না পারার না কি যেতে চাওয়ার?

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত অপর একটি গল্প 'শ্যামল ছায়া' যুদ্ধ-ফেরত এক যুবক যোদ্ধার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-হতাশা মিশ্রিত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তায় আকুল মায়ের গল্প। মাঝরাতে বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না। বই পাঠরত ছেলের জানলায় সকৌতূহলে বারংবার উঁকি দিয়ে জানতে চান, সে কী করছে বা ঘুমোচ্ছে না কেন? ছেলে মৃদু ধমকে মাকে ঘুমোতে পাঠালেও মা রহিমা স্মৃতিতে ডুব দেন ঘুম ভুলতে। আর সেই সূত্র ধরে পাঠকরা জেনে নেয় এক শিক্ষিত যুবক মজিদের স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি। শিখা নামে এক সুন্দরী আধুনিকা যুবতীর প্রেমে পড়েছিল মজিদ। সেই সম্পর্ক তার বাবা-মায়ের কাছেও গোপন ছিল না। তা এত গভীর ছিল যে, বাবার সম্বন্ধ করা পাত্রীকে সে হেলায় অবজ্ঞা করে বিয়ে করেনি। অথচ মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে কোনোমতে প্রাণটুকু বাঁচিয়ে দুই পা হারিয়ে বাড়ি ফেরা মজিদের পাশে কেউ নেই। শিখা, যার রূপ অগ্নিশিখার মতো মনে হত, তার বিয়ে হয়ে গেছে অন্য কোথাও।

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ : 'মৃত্যুগন্ধ' গল্পে স্কুল-টিচার রোগী বাসেত নাক-কান-গলার ডাক্তারের কাছে আসেন অদ্ভুত রোগ নিয়ে যে, তিনি মৃত্যুগন্ধ পান। কোনও মানুষের দেহ থেকে বের হওয়া সেই গন্ধই রোগীকে জানিয়ে দেয় সেই ব্যক্তি মৃত্যুপথযাত্রী। এমনকী ডাক্তারের দেহ থেকেও এমন গন্ধ বের হতে দেখেও কিছু বলতে পারেন না। শুধু অনুরোধ করেন পার্টিতে না যেতে। মেয়ের সঙ্গেই সে রাত্রে সময় কাটাবার প্রস্তাব দেন। যে ডাক্তার বেশি কথা বলেন না, তিনি হঠাৎ বেশি কথা বলতে শুরু করেন। সেই সঙ্গে ক্লান্তিবোধ করেন। বাকি রোগীদের চিকিৎসা না করেই ফিরে যাবার আদেশ দেন। অথচ শিক্ষকের কথা 'ইন্টারেস্টিং' জানিয়ে পরদিন সকালে তাঁর বাড়িতে চা-পানের নিমন্ত্রণ জানান। কিন্তু পাঠক যখন অধীর আগ্রহে জানতে চায়, শিক্ষকের পাওয়া মৃত্যুগন্ধটি তাঁর অলৌকিক অভিজ্ঞতাকে পরিপুষ্ট করল না কি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তের স্বাক্ষর হয়ে উঠল; ঠিক সেই মুহূর্তেই নটেগাছ মুড়িয়ে দেন গল্পকার।

'শবযাত্রা ২' গল্পে রূপকথার গল্পগাথায় উক্ত 'জিন্দালাশ' বাস্তবে উঠে আসার কাহিনি বর্ণিত। না, আধুনিক দ্রুতগামী ব্যস্ত ও বৈজ্ঞানিক শহুরে পরিবেশে নয়, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে। গ্রাম্য, অলস, অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মননে তথা গ্রাম্য শিক্ষক বা ডাক্তারের অচলায়তনিক মস্তিষ্ক-কোটরে একটি মৃত মানুষের পক্ষে জীবিত মানুষের মতো ঘুরে বেড়ানো আশ্চর্যের বিষয় নয়। বরং অপরাধের বিষয়। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী, শিক্ষিত, মানবিক লেখক এই পরিবেশে তাকে দেখতে গিয়ে বড়ো অসহায় এবং বিব্রত বোধ করেন। জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে মর্মে মর্মে অনুভব করেন, লোকটি আদৌ মৃত নন, গুরুতর অসুস্থ। অ্যালজাইমার এবং কোনও কঠিন স্নায়বিক সমস্যায় আক্রান্ত। কেননা নিজের নাম ছাড়া আর কিছুই তার মনে নেই। হাত আগুনে পুড়ে গেলেও ব্যথা অনুভূত হয় না, ভালো খিদেও পায় না। অথচ এই রহমান মিয়া মানুষটি অমানুষিক মূর্খতার শিকার হয়ে নিজেই নিজেকে মৃত মনে করছেন। লেখককে বারবার একটা কথা বলতে চেয়েছেন, যা শুধু লেখকই বুঝতে পারেন। কিন্তু বলতে পারেননি ভুলে যাওয়া রোগের কারণে। লেখক গ্রাম থেকে বিদায় নেবার আগের দিন শেষরাতে শবযাত্রার স্বপ্ন দেখেন। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি রূপকের মতো তুলে ধরতে চেয়েছেন লেখক। একটি অসহায় অসুস্থ মানুষকে নিয়তির হাতে সঁপে দেবার মতো তিনি যেন মূর্খদের মধ্যে কবর দিয়ে যাচ্ছেন। জীবন্মৃত মানুষগুলো অজ্ঞানতার কারণে শকুনের মতো একটা মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার যেন নির্মম ভাবে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

'অচীন-বৃক্ষ' গল্পে অজ-পাড়াগাঁয়ের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হেড মাস্টার মহম্মদ কুদ্দুস অচীন-বৃক্ষ দর্শন করতে আসা মানুষজনদের সেবার ব্যবস্থা করেন। খাওয়া-দাওয়া, থাকার ব্যবস্থা হয় লেখকের জন্যও। কিন্তু যে 'অচীন-বৃক্ষ' দর্শন করতে আগমন খালি পায়ে কাদাজল পেরিয়ে ফিতাকৃমির ভয় উপেক্ষা করে, সেই গাছ তেমন বিশেষ কিছু নয়। অথচ গ্রামের লোকেরা বলে, সেই গাছের বয়স দু'হাজার বছর। দেখতে নিতান্তই সাধারণ কাঁঠাল গাছের মতো, অথচ তার ফুল সর্বরোগহর। স্কুল শিক্ষক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন সেই ফুল ফোটার। তার বিছানার সঙ্গে লেপ্টে মমির মতো হয়ে যাওয়া মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রীকে বাঁচিয়ে তুলবেন। দুর্ভাগ্য এটাই, গ্রামের কুসংস্কার, জড়তা, অশিক্ষার অন্ধকার শিক্ষিত মানুষকেও আবৃত করে রাখে। এগোতে দেয় না উন্নতির পথে, আলোর দিকে। আর সেই কারণেই একটা অচীন বৃক্ষের অলৌকিক ধারণার নাগপাশে নিজের বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে ভালো ডাক্তার দেখাবার বদলে অপেক্ষা

করতে থাকেন ফুল ফোটার। কিন্তু সেই ব্যক্তি তার স্ত্রীর সত্যিকারের গুণগ্রাহী। স্ত্রীর কবিতার খাতা দেখাবার জন্য জল-কাদা ডিঙিয়ে স্টেশনে পৌঁছে যান লেখককে দেখাতে ভুলে গেছেন বলে। তার এই আগ্রহের এক সঞ্জীবনী শক্তি আছে। প্রথমত, লেখক সেই কবিতাগুলির যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন, তার 'Positive Energy' শিক্ষকের স্ত্রীকে সুস্থতা দানে সহায়ক হবে। দ্বিতীয়ত, তার স্ত্রী যদি অচীন-বৃক্ষের ফুল ফোটার মরশুম পর্যন্ত বেঁচে নাও থাকেন, তবু তার সৃষ্টি বেঁচে থাকবে চিরকাল ছাপার অক্ষরে। এই কারণে ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে দূর থেকে শিক্ষককে দেখে লেখকের মূর্তমান, কল্পতরুর মতো অচীনবৃক্ষ মনে হয়। এখানেও সেই গল্পপাঠে অতৃপ্তি। পাঠক-সমাজ কল্পনার জাল বুনতে থাকে, সদর্থক আর নঞর্থক পরিণতির দোলাচলতায়। ভারাক্রান্ত পাঠক হৃদয়ে দ্বন্দ্ব চলে, ফুল ফুটুক তাড়াতাড়ি। বেঁচে উঠবে তাদের ভর-ভরন্ত সংসার। যদি না ফোটে তবে স্মৃতি আঁকড়ে জীবন কেটে যাবে।

বাস্তব বনাম অলৌকিক : ভূত-বিষয়ে লেখকের আগ্রহ কেমন সে বিষয়ে একটি সাক্ষাৎকারে লেখক জানান, আমি মনে" করি না ভূত বলে কিছু আছে। ভূত না থাকলেও ভূতের ভয় আছে। ভূতের ভয় আছে বলেই ভূতের গল্প আছে।"[৫] 'ছায়াসঙ্গী' গল্পে কবর থেকে উঠে আসা দশ-এগারো বছরের বালক মন্তাজ মিয়া অনেকটা সমাজচ্যুত অবস্থাতেই বেঁচে থাকে গ্রামে। সেই গ্রামকে "অজপাড়াগাঁ বললেও সম্মান দেখানো হয়।"[৬] এই গ্রাম্য পরিবেশের মানুষদের চিন্তা-ভাবনা এতটাই গ্রাম্য যে অসহায় বালকটিকে শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হয় না, তাকে স্কুলে পাঠানো হয় না। অথচ তাকে চোর বদনাম দিয়ে রাখা হয়েছে। কারও ত্রি-সীমানায় তাকে ঘেঁষতে দেওয়া হয় না। লেখকের সামান্য বল-পয়েন্ট কলমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তা নিলে সবাই মিলে মারতে থাকে। লেখক তাকে সমর্থন করলে কৃতজ্ঞতার প্রকাশ দেখা যায় তার চোখে। এদিকে তাদের হতদরিদ্র অবস্থা, অথচ ছোট চাচা সব জমিজমা ভোগদখল করছে। আর তার শরিক মন্তাজ জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ হয়ে পড়লে তাড়াতাড়ি তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে কবর দিয়ে দেওয়া হয় দিনের আলো থাকতেই। তার দিদি রহিমা শ্বশুরবাড়ি থেকে ছুটে আসে। দিদির তৎপরতায় পুনরুদ্ধার হয় মন্তাজ মিয়ার জীবন। কবর থেকে ক্লান্ত পিপাসার্ত বাচ্চাটিকে বসে থাকতে দেখে সবাই অভিভূত। আর সে তার চারপাশ ঘিরে তৈরি করে নেয় অলৌকিক আবরণ। শ্যাওলা-গন্ধী অজানা অচেনা অলৌকিক ছায়াসঙ্গী তাকে আদর করেছে, সঙ্গ দিয়েছে। সমাজকে দ্বিধায় রেখে গোপন করেছে তার পরিচয়, নিজের ন্যুনতম মূল্যটুকু বজায় রাখার জন্য। কারণ, সমস্ত পৃথিবীতে দিদি ব্যতিরেকে সেই একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী।

'কুকুর' গল্পটিতে পোস্টাল সার্ভিসে কাজ করে অবসরপ্রাপ্ত আলিমুজ্জামান নামক লোকটি গল্পের কথক প্রফেসর সাহেবকে তার জীবনে ঘটে যাওয়া এক মর্মান্তিক ঘটনা শোনানোর জন্য উৎসুক। আর সেই ঘটনা-সূত্রে তিনি যে অলৌকিক ব্যাপারের শিকার হয়েছেন, তা ভাষ্যকারকে জানাতে চান। হাজার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক বৃহস্পতিবার প্রফেসর উপস্থিত হন তার বাড়ি। একবার আলিমুজ্জামান অফিস থেকে ফেরার পথে দেখেন, ছোট্ট কুকুরছানাকে ঘুঙুর পরিয়ে গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয় ছোট ছোট ছেলেরা। উদ্দেশ্য, কুকুরটি আগুনের জ্বালায় ছটফট করবে আর ঘুঙুর ঘুং ঘুং শব্দ করবে। অমানবিক মজার হাত থেকে কুকুরটিকে বাঁচাতে লোকটি ঝাঁপ দেন আগুনে এবং উদ্ধারও করেন। কিন্তু কুকুরটি ঝলসে মারা যায়, তিনি নিজেও বিভৎসভাবে আহত হন। এরপর থেকে প্রায়ই তার চোখের সামনে ঘটতে থাকে অলৌকিক ঘটনা। ছ'মাস বা এক বছর অন্তর। বহু-সংখ্যক কুকুর দল বেঁধে তার বাড়ির সামনে বসে থাকে, সেই ঝলসে কালো হয়ে যাওয়া মৃত কুকুরটিকে সামনে নিয়ে। এরকম দৃশ্য দেখতে পাওয়া হয়তো তার কুকুর-প্রীতির কারণেই বলে অন্যেরা মনে করে। কিন্তু আলিমুজ্জামান জানান, তিনি একাই দেখতে পান ঝলসানো কুকুরটিকে, আর কেউ না। লেখক এই অলৌকিকতার সামনে দুটি বৈপরীত্য রেখে দেন। একদিকে, রিটায়ার্ড করা লোকেরা বেশি কথা বলেন। আর এর দোষ হল, বেশি কথা বললে অবান্তর কথারও মাত্রা বাড়ে। দ্বিতীয়ত, সেই ব্যক্তির সংগ্রহে থাকা ষোলো হাজার বইয়ের সমাহার। এত বই যে পড়ে, তার চিন্তা-ভাবনা কখনও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হতে পারে না। এই দ্বিধার মধ্যে রেখে লেখক-বিধাতা বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রতিনিধি প্রফেসরকে রাত দুটোর সময় আলিমুজ্জামানকে দিয়ে টেলিফোনে

ডাক দেন, কুকুরের সভা দেখার জন্য। প্রফেসর জল-কাদা ডিঙিয়ে যাবার থেকে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে থাকাই শ্রেয় মনে করেন। আসলে, জগতে এমন কিছু রহস্য যা আমরা রহস্যাবৃত রাখতেই চাই।

'ভূতমন্ত্র' গল্পে ভূত সম্পর্কে সাধারণ ভয় বা ক্ষতির ধারণা বদলে যায়। বাবলুকে একা বাসায় রেখে, কঠিন কঠিন অঙ্ক কষতে দিয়ে তার মা ও সৎ বাবা বেড়াতে বেরিয়ে যান। তার খুদে শিশুমন এই একাকিত্বে জেরবার হয়ে পড়ে। তার নিজের বাবার অভাব-বোধ করতে থাকে। ঠিক এই সময় তার ঘরে আসে লাল জামা পরা একটি ছোট্ট ছেলে, যে তার সঙ্গে খেলতে চায়। এক গ্লাস গরম দুধে পেপসির মন্ত্র পড়ে দেয়। ইচ্ছামতো খাবার খাওয়া এবং অদৃশ্য হবার মন্ত্র লিখে দিয়ে যেতে চায়। বাবলু বিশ্বাস করে না। কিন্তু ছেলেটি চলে যাবার পর গ্লাসে পেপসি দেখে বিশ্বাস হয়। তবে "সব পেয়েছির দেশে" পৌঁছে দিতে চাওয়া ছেলেটিকে আর পায় না। আলোচ্য গল্পটি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন' গল্পে ভূতের রাজার কথা মনে করিয়ে দেয়, যিনি তিনটি স্বেচ্ছা বর দিয়েছিলেন গুপী - বাঘাকে।

'পানি রহস্য' গল্পে চল্লিশের বয়সসীমা পার হয়ে যাওয়া অকৃতদার অশিক্ষিত যুবক জয়নাল তার প্রিয় জ্ঞানী মানুষ মবিন সাহেবকে বলতেই পারে না, জল ঘিরে তার জীবনেও এক রহস্য আছে। শুধু টলস্টয়ের কাহিনিতে বর্ণিত জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলা মনীষীদের গল্প শুনে যায় বারংবার। শেষে শীতের কষ্ট লাঘব করতে মবিন সাহেব তাকে পুরোনো কোট দেবার পরেই সে নিউমোনিয়াতে ভয়ংকরভাবে আক্রান্ত হয়। তার কামারশালার মালিক সতীশের কাছ থেকে জানা যায়, সে দশ বছর ধরে গোসল করেনি। এই রহস্যের সমাধান জয়নাল নিজেই করে মৃত্যুশয্যায়। একটা বাছুরকে বাঁচাতে গিয়ে দেখে জলের উপর দাঁড়িয়ে আছে, হেঁটে নদী পার হয়েছে, শুধু পায়ের পাতা ভিজেছে। এটা আদৌ কোনও অলৌকিকতা না কি অমূলক জলের ভয় বোঝা যায় না। তবে, লেখক অলৌকিকতাকে গাঢ় করতে গল্পের শেষে জয়নালের মৃত্যুর পর হাসপাতাল চত্বরে নিয়ে আসেন মাজা-ভাঙা কুকুরকে, যার কোনও চলৎশক্তিই ছিল না।

অন্তঃসলিলা মানবিকতা : 'রূপা' গল্পে গল্পের কথক এক অপরিচিত ব্যক্তির জীবনের অদ্ভুত ঘটনা শোনেন। যৌবনে সুপুরুষ থাকা ব্যক্তিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় একটি মেয়ের রূপমুগ্ধ হন। এতটাই উন্মত্ত অবস্থা যে তার বাড়ির সামনে গিয়ে আমৃত্যু অনশনে বসেন, যতক্ষণ না সে বিয়েতে রাজি হয়। কিন্তু যতক্ষণে তিনি জানতে পারেন, এই মেয়ে সেই মেয়ে নয়, ততক্ষণে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেছেন মেয়েটির মানবিকতায়। মেয়েটির বাড়ির সমস্ত মানুষ যখন তাকে তাড়াতে ব্যস্ত, তখন মেয়েটিই একমাত্র তাকে আশ্রয় দিয়েছে, করুণা করেছে। এই মেয়েই তার স্ত্রী, যাকে তিনি রিসিভ করতে এসেছেন স্টেশনে। দুনিয়ার যাকে পারেন তাকেই বলেন বিবাহের এই ইতিহাস, শুধু স্ত্রীকে বলতে পারেন না। এই দ্বিধা নিছক অন্তঃসলিলা মানবিকতা না কি রূপের ঊর্ধ্বে উঠে প্রকৃত প্রেমের গভীরতাকে চিনে নেওয়া?

'বুড়ি' গল্পে আমেরিকায় পড়তে যাওয়া গল্পের কথক পায়রার খোপের মতো ছোট ছোট ঘরযুক্ত রুমিং হাউসে আশ্রয় নেন। সেখানে পঞ্চম বোর্ডে থাকা এক বুড়ি তার সঙ্গে আলাপ করতে চান। কথার আতিশয্য আর সময় নষ্টের ভয়ে তাকে এড়িয়ে চলেন কথক। কিন্তু সারাদিন পরিশ্রমের পর শুতে গিয়ে বিপত্তি। বুড়ির ব্যাগ-পাইপ বাজানোর জন্য ঘুম আসে না। কথক বিরক্তি প্রকাশ করলেও বুড়ি নির্বিকার। সে একাই পার্টি করে। শেষে অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য বিক্রি করে দিতে হয় ব্যাগ পাইপ। ক্ষমা চেয়ে বলে, "কুৎসিত বাজনাটা বাজালেই তোমরা কেউ না কেউ আসতে — খানিকক্ষণ কথা বলতে পারতাম।"[৭] যে ব্যাগ পাইপ সকলের বিরক্তির কারণ, সেই বাজনাই সকলে মিলে চাঁদা তুলে কিনে দেয় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরা বুড়িকে।

'অপেক্ষা' গল্পে কেরামত ত্রিশ-পয়ত্রিশ বছর বয়স থেকে পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বয়স পর্যন্ত ঘর বাঁধার স্বপ্নে কাটিয়ে দেয়। সে শুধু অপেক্ষা করে, কবে বশির মোল্লা তার বিয়ের ব্যবস্থা করবেন। অথচ বশির মোল্লার জীবনের ছোটখাটো উত্থান-পতন ঘটতে থাকে। কিন্তু নিজেকে তিনি এত ব্যস্ত মানুষ হিসেবে প্রতিপন্ন করেন যে কেরামতের তাড়া লাগাবার কোনও সাহসই থাকে না। বশির মোল্লার বারংবার দেওয়া মিথ্যা প্রতিশ্রুতি সে বুঝতে পারে না। জীবনের প্রান্তভাগে

দাঁড়িয়েও কেরামত ফলের আশায় গাছ পোঁতে। সন্ধ্যায় শূন্য ঘরে ফিরে অনাগত স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের কথা ভাবতে তার ভালো লাগে। এতই ভালো মানুষ সে। লেখক এখানে সততা আর ভালোমানুষীর সুযোগ নিয়ে সমাজের অবিচারক ও অবিবেচক মানুষদের চিত্র তুলে ধরেছেন। মানবিকতার অবনমনের দৃষ্টান্ত এই গল্পটি।

পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব : পিঁপড়ের কামড়কে লেখক Symbolic ভাবে গ্রহণ করেছেন অনেক গল্পে। জীবনের শেষ সাক্ষাৎকারে পিঁপড়ের কোনও বিবেক বুদ্ধি নেই বলা হলে হুমায়ূন আহমেদ জবাব দেন,

> "তাদেরও বুদ্ধি আছে। ...ওই পিঁপড়াকে যদি আমি পায়ের তলায় পিষে ফেলি, তাহলে তার দফা রফা শেষ। মানুষও এমন। আমাকে এভাবে বলো না। অনেক ধর্মীয় লোকজন আছেন যারা মনে কষ্ট পাবেন।"[৮]

পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে পিঁপড়ে যেন মূর্তমান পুণ্য, আর তার কামড় পুণ্যের কামড় বা সাবধান বাণী কিংবা কৃতকর্মের শাস্তি। যেমন, 'পিঁপড়া' গল্পে মোহম্মদ মকবুল হোসেন ভুঁইয়া লোকটি ডাক্তার দেখাতে আসে এই রোগ নিয়ে যে সে যেখানেই যায় পিঁপড়ে কামড়ায়। দু-পাঁচটি নয়, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে তাকে ঘিরে ধরে কামড়ায়। বহু ধন-সম্পত্তির মালিক হয়েও তার মানসিক শান্তি নেই। বিষয়টি আধিভৌতিক লাগলেও লেখকের দেওয়া ইঙ্গিতটুকু ধরতে পারা যায়। মকবুল টাকার গরমে এবং চরিত্র-দোষবশত তার দূর সম্পর্কীয় এক বোনের মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সে ডাক্তারকে জানায় যে, ইঁদুর-মারা বিষ খেয়ে মা-মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। খুনের দরকার হয়নি। সেই লাশগুলোর পচে ওঠা শরীরে যে লাখ লাখ পিঁপড়ে সে দেখেছিল, তারাই তাকে শান্তি দেয় না। বোঝা যায়, খুন সেই করেছে, পরোক্ষভাবে। আগত পিঁপড়েদের "নে খা"[৯] বলে আহ্বান জানালে তারা থমকে যায় কিছুক্ষণের জন্য। যেন শাস্তিকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য স্বস্তি দান করা।

অন্যদিকে, 'কৃষ্ণপক্ষ' গল্পে হানিফ গাছ-গাছড়ার ঝুপড়িতে জারুল গাছের নিচে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে থাকে কৃপণ-স্বভাবের নওয়াবগঞ্জের মুনশি রইসুদ্দিকে হত্যা করবার মতলবে। হত্যা করার উদ্দেশ্য একটাই, প্রচুর টাকা বকশিশ হিসেবে পাওয়া। ছ'হাজারের চুক্তি, অর্ধেক মিলেছে, বাকিটুকু খুনের পর। কৃষ্ণপক্ষের রাতের অন্ধকারে, 'তালপাকা' গরমে ঘামে ভিজে দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করতে করতে খুনির মনেও নানা চিন্তা-তরঙ্গ খেলে। কারণ, স্বভাবতই খুনি হলেও সে একজন মানুষ। খুনি হওয়ার গরিমাটাই প্রথমে মনে আসে। খুন করার পর তাকে দিয়ে খুন করানো লোকগুলো 'আপনি' বলে সম্বোধন করে। কত পয়সা, লোক-লস্কর, পুলিশের আনাগোনার আড়ালে থেকে সে মজা দেখে। মনে পড়ে রইসুদ্দির ছোট্ট পাঁচ-ছয় বছর বয়সী মেয়ে ময়নার কথা। তার বাবাকে মারবার জন্য তার বাড়িতে আনাগোনা করার সময় যার সঙ্গে আলাপ। পিতৃহারা হলে সে খুব কাঁদবে ভেবে খারাপ লাগে। কারণ তার মতোই ছোট্ট বয়সে তার বড়ো মেয়ে চিকিৎসার অভাবে মারা যায়। হানিফের মনে এই যে মানবিকতার উদয় হয়, তা থেকেই পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্বের সূচনা। মৃত মানুষগুলোর শেষ কথা মনে আসে। তার নিজের মেয়েই মরে যেতে যেতে বলেছিল, "বাজান আপনে হাসতাছেন ক্যান। কী হইছে?"[১০] তার শোকার্ত কান্না মেয়ের কাছে হাসি হয়ে পৌঁছেছে। হানিফের অবচেতন মন কি তবে নিজের মেয়েকেও খুন করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করে? ঠিক এই সময় পিঁপড়ের কামড় খায় সে, যা রাতের অন্ধকারে অসম্ভব। আর রহিসুদ্দিও এসে পড়ে। পাঠকরা ধন্দে পড়ে যান হানিফ তবে কী করবে? টাকার লোভ ভুলে মানবিক হবে না কি পাপের পথটাই প্রশস্ত করবে?

লেখকের যা কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সবই জীবনকে ভালোবেসেই। মৃত্যু বিষয়টিকে লেখক মেনে নিতে পারেননি সহজভাবে। জনপ্রিয় অপর এক লেখক ইমদাদুল হক মিলনকে হুমায়ূন আহমেদকে এই বিষয়ে বলেন,

> "আমি থাকবো না, এই পৃথিবী পৃথিবীর মতো থাকবে। বর্ষা আসবে, জোছনা হবে। কিন্তু সেই বর্ষা দেখার জন্য আমি থাকব না। জোছনা দেখার জন্য আমি থাকব না। এই জিনিসই আমি মোটেও মেনে নিতে পারি না।"[১১]

তথ্যসূত্র :

১. সাক্ষাৎকার — সূত্র, https://www.sakkhatkar.com/interview-of-bangladeshi-writer-humayun-ahmed/
২. হুমায়ূন আহমেদ, গল্প সমগ্র, দ্বিতীয় প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪, কাকলী প্রকাশনী, ১৫২/৪-বি সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ৩৭
৩. নজরুল ইসলাম, সঞ্চিতা, ত্রয়ষষ্টতম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ, ১৪১৩, নভেম্বর, ২০০৬, ডি. এম, লাইব্রেরি, ৪২ বিধান সরণী, কলকাতা- ৭০০০০৬, পৃ. ২
৪. হুমায়ূন আহমেদ, গল্প সমগ্র, দ্বিতীয় প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪, কাকলী প্রকাশনী, ১৫২/৪-বি সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ৩৮৪
৫. সাক্ষাৎকার— সূত্র, দৈনিক ইত্তেফাক, নভেম্বর ০৭, ২০০৮ (https://kobita.mohool.in/index.php/choto_golpo/33-humayun-ahmed-short-story/104519)
৬. হুমায়ূন আহমেদ, গল্প সমগ্র, দ্বিতীয় প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪, কাকলী প্রকাশনী, ১৫২/৪-বি সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ৩৪৩
৭. হুমায়ূন আহমেদ, গল্প সমগ্র, দ্বিতীয় প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪, কাকলী প্রকাশনী, ১৫২/৪-বি সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ১৯
৮. সাক্ষাৎকার— সূত্র, https://www.sakkhatkar.com/interview-of-bangladeshi-writer-humayun-ahmed/
৯. হুমায়ূন আহমেদ, গল্প সমগ্র, দ্বিতীয় প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪, কাকলী প্রকাশনী, ১৫২/৪-বি সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ৩৫
১০. হুমায়ূন আহমেদ, গল্প সমগ্র, দ্বিতীয় প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪, কাকলী প্রকাশনী, ১৫২/৪-বি সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ৩৪২
১১. সাক্ষাৎকার— সূত্র, দৈনিক ইত্তেফাক, নভেম্বর ০৭, ২০০৮ (https://kobita.mohool.in/index.php/choto_golpo/33-humayun-ahmed-short-story/104519)

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১. নজরুল ইসলাম, সঞ্চিতা, ত্রয়ষষ্টতম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ, ১৪১৩, নভেম্বর, ২০০৬, ডি. এম, লাইব্রেরি, ৪২ বিধান সরণী, কলকাতা- ৭০০০০৬
২. মহাশ্বেতা দেবী, ছোটগল্প সংকলন, সপ্তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১১ (শক ১৯৩৩), ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, বসন্ত কুঞ্জ, ফেস II, নয়াদিল্লি- 110070
৩. সাক্ষাৎকার— সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, নভেম্বর ০৭, ২০০৮ (https://www.ebanglalibrary.com/55703/
৪. সাক্ষাৎকার—সূত্র, https://www.sakkhatkar.com/interview-of-bangladeshi-writer-humayun-ahmed/
৫. সাক্ষাৎকার— সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, নভেম্বর ০৭, ২০০৮ (https://kobita.mohool.in/index.php/choto_golpo/33-humayun-ahmed-short-story/104519)
৬. হুমায়ূন আহমেদ, গল্প সমগ্র, দ্বিতীয় প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪, কাকলী প্রকাশনী, ১৫২/৪-বি সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯